অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শাদা ঘোড়া

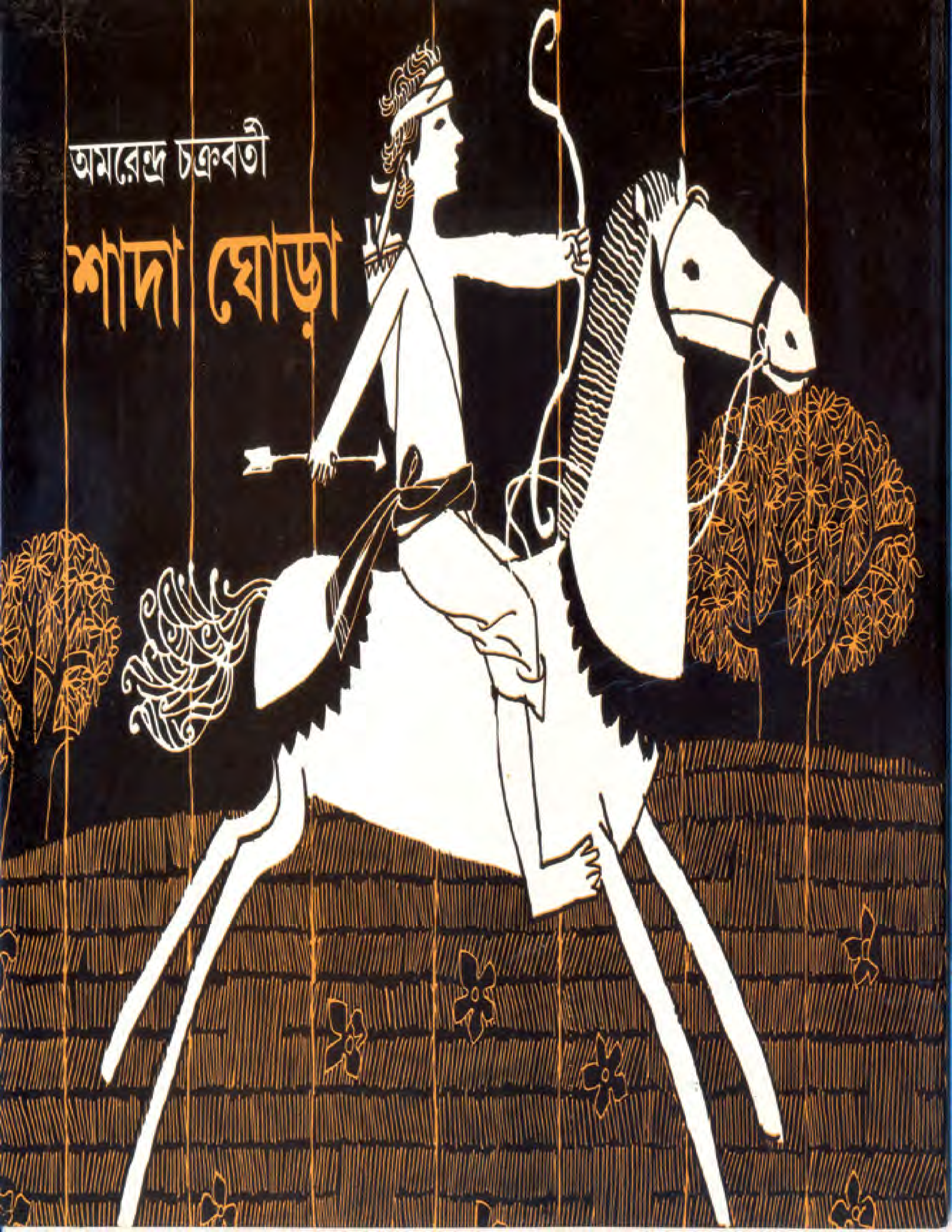

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
শাদা ঘোড়া

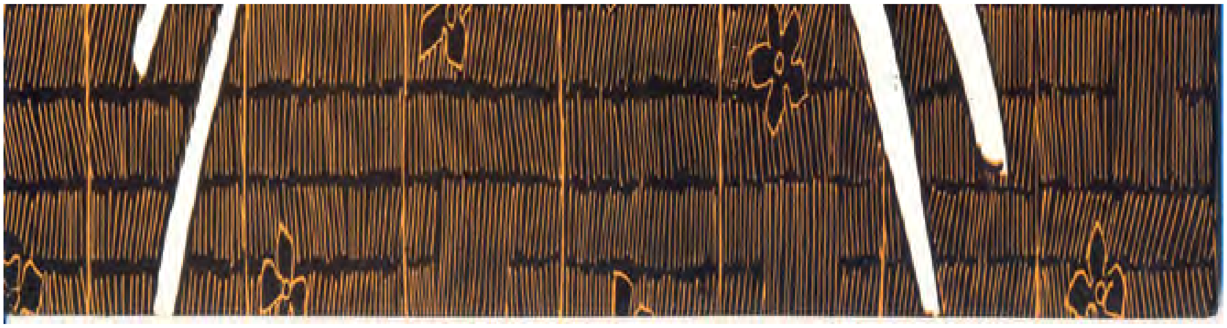

শাদা .ঘাড়া

SHADA GHORA
A fairytale for children
by Amarendra Chakravorty
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত
প্রথম প্রকাশ : আনন্দ পাবলিশার্স, মে ১৯৭৯
প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ (৪৫০০ কপি)
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ (১১২০০ কপি)
প্রথম পৃথক স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০০
(৩১০০ কপি)
চতুর্থ স্বর্ণাক্ষর মুদ্রণ
মে ২০০১
(১১০০ কপি)
পঞ্চম মুদ্রণ
জুন ২০০৭
(৩১০০ কপি)
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দেবব্রত ঘোষ
©
কপিরাইট
মৈত্রেয়ী নাগ

ISBN 81-86891-27-7
প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১ বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শাদা ঘোড়া

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

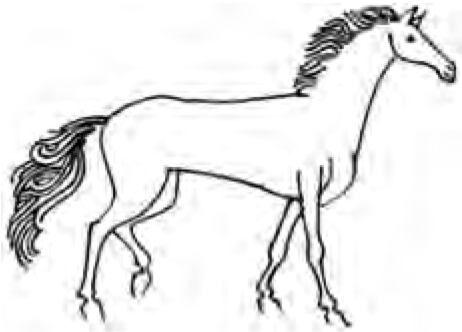

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

এই লেখকের ছোটদের অন্যান্য বই

হীরু ডাকাত

ঋষিকুমার

গৌর যাযাবর

আমাজনের জঙ্গলে

হরিণের সঙ্গে খেলা

তালগাছের ডোঙা

পাখির খাতা

আমার বনবাস

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

ভূতের বাঁশি

অনূদিত বই

নীল পাহাড় পেরিয়ে

আকাশের কোন তারাটা আমার মা?

সেই তারাকে

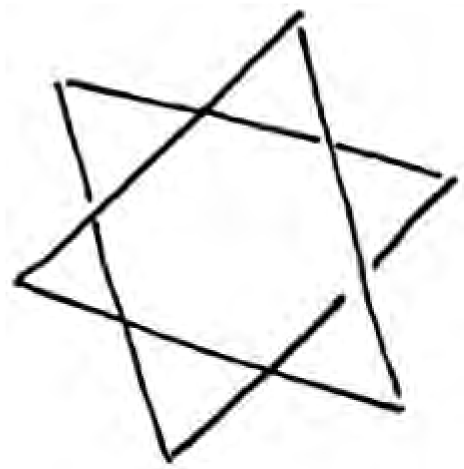

শাদা ঘোড়া

১
২
৩
৪
৫

১

আমার একটা শাদা .ঘাড়া আছে । গত বছর বর্ষাকালে আমি মাতলাগাঙের ওপারে গিয়েছিলাম, সেখানে মাঠের মধ্যে একটা খাদ থেকে আমি ঘোড়াটাকে নিয়ে আসি । ওর তখন ছ-মাসও হয়নি । ঘোড়াটা খাদের মধ্যে পড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল ।

এই শরতে ওর বয়েস দু-বছর হতে চলল । এর মধ্যে ওর গায়ের রং আরও ধবধবে হয়েছে, আর কপালের ঠিক মাঝখানে বাদামি রেখাটাও আরও সুন্দর হয়েছে । ও কথা বলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু আমার সব কথা বুঝতে পারে । আমি ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিলে ও মাথা নিচু করে থাকে, একটুও নড়ে না । ও যখন কপালের দু-পাশের দুই বড়-বড় চোখ তুলে আমার দিকে তাকায়, আমি বুঝি ও কী বলতে চায় । আমি ওর নাম রেখেছি শাদাপাল ।

আমার নাম বিজয় । আমি বিজয়া দশমীর দিন জন্মেছিলাম । আমাদের উঠোনে একটা সুপুরিগাছ আছে, সেটা আমার জন্মের বছরে হয়েছিল । গাছটার গায়ের বলয় গুনে আমার বয়সের হিসেব রাখা হত । এসব আমার মায়ের মুখে শোনা । মা যে-বছর জ্বর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আর উঠল না, পাড়ার লোকেরা মাকে কোথায় নিয়ে গেল, সে-বছর সুপুরিগাছে পাঁচটা বলয় ছিল । বাবা যে-বছর খেত থেকে সাপের ছোবল খেয়ে ঘরে এল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল, আর উঠল না, পাড়ার লোকেরা বাবাকে কোথায় নিয়ে গেল, সে-বছর সাতটা বলয় ছিল ।

সে-বছর থেকেই আমি মল্লিকবাবুদের বাড়ির গরু চরাই । ভোরবেলা গোয়াল থেকে গরুগুলোকে নিয়ে মাঠে যাই, সারাদিন ঘাস খাইয়ে আবার গোয়ালে তুলে দিই ।

তাছাড়া বছরে একবার করে বাবুদের গরু কিনতে মাতলাগাঙের ওপারে যাই ।

সন্ধেবেলা মাঠ থেকে ফেরার সময় রোজই আমি খানিকটা ঘাস কেটে আনি । গামছায় বাঁধা ঘাসের পুঁটলি কাঁধে আমাকে ঘরে ফিরতে দেখে শাদাপাল আনন্দে যা যা করে তা না দেখলে আমার ভালো লাগে না । সে এমনিতেই খুব সুন্দর, তার ওপর কচি-কচি ঘাস দেখে সে যখন খুশি হয়ে ওঠে, আর ঘাস খেতে-খেতে পিছনের একটা পা মাটিতে ঠুকতে থাকে, তখন তাকে এত সুন্দর দেখায় যে বলে বোঝানো যায় না । একদিন, তখনও

ভালো করে সন্ধে হয়নি, আমি বাবুদের গরুগুলো গোয়ালে তুলে দিয়ে শাদাপালের ঘাসের পুঁটলি কাঁধে ফেলে চলে আসছি, এমন সময় বাবুদের চাকর বিশ্বম্ভর এসে আমার পথ আটকে দাঁড়াল । বিশ্বম্ভর বলল, 'রাজাবাবু তোকে তলব করেছেন ।'

ওদিকে শাদাপালকে খেতে দেওয়ার সময় হয়েছে, তবু কী আর করি— বিশ্বম্ভরের পিছু-পিছু এদালান-সেদালান পেরিয়ে একেবারে রাজাবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম । রাজাবাবু আরাম কেদারায় শুয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন, পাশে তাঁর মেয়ে টুকটুক দাঁড়িয়ে ।

আমি কোমর ভেঙে রাজাবাবুকে নমস্কার করে করজোড়ে ঘরের বাইরে বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে রইলাম । রাজাবাবু তামাক খেয়েই চলেছেন, কিছু বলছেনও না, ওদিকে শাদাপালের কথা ভেবে আমি মনে-মনে ছটফট করছি । এতক্ষণে সে নিশ্চয় আমাকে না-দেখে চিঁহিঁ-চিঁহিঁ করে ডাকতে শুরু করেছে । কিছুক্ষণ পর রাজাবাবু মুখ থেকে নল নামিয়ে বললেন, 'তোর শুনেছি একটা ঘোড়া আছে— কথাটা ঠিক?'

আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল । কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন! আমি কোনওরকমে মাথা নেড়ে জানালাম, আছে ।

'কতয় বেচবি?'

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে আমি বললাম, 'ও আমি বেচব না রাজাবাবু ।'

'বেচবি না কী-রে! শোন, আমার মেয়ে টুকটুকের শখ হয়েছে ও রোজ ওই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবে । তোর ঘোড়া ও দেখেছে, ওর খুব পছন্দ ।'

রাজাবাবুর মুখের ওপর কথা কইতে পারে, আমাদের গ্রামে এমন মানুষ একজনও নেই । আমি কোথা থেকে সাহস পেলাম জানি না, মৃদু গলায় বললাম, ‘ওর এখনও দু-বছর পুরো হয়নি, ও কী করে দিদিমণিকে পিঠে নেবে? ও তো এখনও বাচ্চা ।’

রাজাবাবু আবার নল মুখে নিয়েছিলেন, নলটা দাঁতে চেপে রেখে বললেন, ‘সে-ভাবনা তোর নয় । ঘোড়া যখন, একদিন বড় হবেই ।’

নলটা মুখ থেকে নামিয়ে আবার বললেন, ‘আজ রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে কাজে আসবার সময় ঘোড়াটাকে এখানে দিয়ে খাজাঞ্চির কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যাস—দাম একটু বেশিই দিলাম ।’

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন । আমি চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাজাবাবুর পায়ের ওপর পড়ে বললাম, ‘ঘোড়া আপনি কেড়ে নেবেন না রাজাবাবু । ও ঘোড়া আমি দিতে পারব না ।’

‘কেন-রে, তোর ঘোড়া সোনার ডিম পাড়ে নাকি? পা ছাড়’ —বলে রাজাবাবু মচমচ শব্দ করে চলে গেলেন ।

এমন সময়, রানিমা দুধের বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন । আমাকে দেখে বললেন, ‘কী হয়েছে রে বিজু?’

আমি রানিমার দিকে চেয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেললাম । কাঁদতে কাঁদতে বললাম, ‘কাল সকালে রাজাবাবু আমার ঘোড়া নিয়ে নেবেন ।’

রানিমা দুর্গাপ্রতিমার মতো চোখ মেলে বললেন, ‘তা তোর যদি দিতে ইচ্ছে না-হয়, দিবি কেন? রাজাবাবুকে আমি বলে দেবখন ।’

‘রাজাবাবু যদি আপনার কথা না শোনেন?’

‘তোর ঘোড়া তো উনি জোর করে নিতে পারেন না । তুই যদি বেচতে না-চাস, উনি চাইবেন কেন?’

রানিমার মেয়ে দুধ খাচ্ছিল, মুখ থেকে দুধের বাটি নামিয়ে বলে উঠল, ‘হ্যাঁ মা, ওই ঘোড়া আমার চাই । ওই ঘোড়ায় চড়ে আমি বেড়াতে যাব । কী শাদা, কী সুন্দর!’

আমি এবার সোজাসুজি টুকটুককেই বললাম, ‘তোমাদের তো বড়-বড় ঘোড়া আছে, তোমাদের কত সুন্দর-সুন্দর কত-কী আছে, তোমাদের কত বড় বাড়ি, কত বড় বাগান, তোমার গায়ে কত সুন্দর জামা, গয়না, কত তোমার খেলনা— আমি কি কখনও সেসব চেয়েছি? তবে কেন তুমি আমার ঘোড়া নিতে চাও?’ একটু দম নিয়ে আবার বললাম, ‘তুমি যদি আমার ঘোড়া না-চাও, আমি তোমাকে দিঘি থেকে আমার ঘোড়ার মতো শাদা পদ্ম, বন থেকে নীল রঙের পাখি— আরও অনেক কিছু এনে দেব ।’

শুনে, সে কী ভাবতে লাগল। আমার তখন শাদাপালের কথা মনে করে খুব কষ্ট হচ্ছে। এখনও ওকে ঘাস-জল দিইনি, এর আগে কোনওদিন আমাকে এতক্ষণ না-দেখে ও থাকেনি। আমার মনে হল, আমি যেন ওর চিঁহিঁ-চিঁহিঁ ডাক শুনতে পাচ্ছি।

এইসব ভাবছি, এমন সময় টুকটুক বলল, ‘আচ্ছা, তুমি যদি আমার বর হও, তাহলে আমি তোমার ঘোড়া নেব না। তুমি আমাকে রোজ ওই ঘোড়ায় চড়িয়ে একবার শুধু বেড়িয়ে আনবে।’

তখনও আমার চোখের জল শুকোয়নি, তারই মধ্যে বুকের ভেতরটা আনন্দে গুরগুর করে উঠল। ওই রাঙা টুকটুকে মেয়েটা যদি আমার বউ হয় তাহলে শুধু আমার নয়, শাদাপালেরও আনন্দের সীমা থাকবে না। শাদাপালের পিঠে আমার রাঙা টুকটুক বউ চলেছে সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে— সেই সবুজ মাঠ চলে গেছে ওই নীল আকাশ পর্যন্ত, মনে মনে আমি এইরকম দেখলাম। কিন্তু তা কী করে হবে! টুকটুক হল গিয়ে রাজবাড়ির আদরের রাজকন্যা, সকলের চোখের মণি, আর আমি সে-বাড়ির রাখাল, সারাদিন মাঠে-মাঠে গরু চরিয়ে বেড়াই। আমাকে মাথা নিচু করে বসে-বসে ভাবতে দেখে রানিমা হেসে বললেন, ‘বিজু দেখছি বিয়ের ভাবনায় একেবারে মশগুল। আগে বড় হ, মানুষের মতো মানুষ হ, তবে তো মনের মতো কনে হবে।’ তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, ‘তুমিও মা বড় হয়ে বরের কথা ভেবো। এখন পড়তে চলো, রাত কম হয়নি।’

বলে রানিমা উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমিও তাঁকে প্রণাম করে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় রাজাবাবু ঘরে ঢুকলেন।

আমাকে দেখে বললেন, ‘ঘোড়াটার একটা নাম ভেবেছি। কাল ভোরেই দিয়ে যাস।’

২

ভোর হবার অনেক আগে, নিশুতি রাতে, গ্রামের পাখিরাও যখন ঘুমোচ্ছে, আকাশের তারা ছাড়া কেউ কোথাও জেগে নেই, সেই সময় শাদাপালকে নিয়ে আমি গ্রাম ছাড়লাম । সারারাত হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে একটা শান-বাঁধানো পুকুর দেখে যখন শাদাপালকে জল খাওয়াবার জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশে ভোরের রং ধরেছে, জলে আলোর কুঁড়ি ফুটেছে, দুটো-একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে ।

হেঁটে-হেঁটে শাদাপাল খুবই ক্লান্ত হয়েছিল, জলে নেমে সবে জিভ দিয়ে জল ছুঁয়েছে, ভোরবেলার জলে আমি তার ফুটফুটে ছায়া দেখছি, এমন সময় পিছনে হুংকার শুনে চেয়ে দেখি বল্লম হাতে রাজবাড়ির পেয়াদারা এসে দাঁড়িয়েছে ।

তাদের মধ্যে একজন বল্লমের উল্টো দিকটা মাটিতে ঠুকতে-ঠুকতে বলল, ‘ওরে পুঁচকে রাখাল, যমকে ফাঁকি দিতে পারিস, মল্লিকপুরের রাজাবাবুকে ফাঁকি দেওয়া যায় না ।’ বলে লোকটা তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে এসে আমার দু-হাত পিছ-মোড়া করে ধরে রইল । বাকিরা নিমেষে শাদাপালকে ঘিরে ফেলে মোটা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে এমন করে তাকে বাঁধল যে মনে হল তার ধবধবে শাদা গায়ে দড়ির বাঁধন কেটে বসে গিয়ে এখুনি রক্ত ফুটে বেরুবে ।

শাদাপালকে বেঁধে তারা আমারও দু-হাত শক্ত করে বাঁধল । তারপর আমাদের সামনে ও পিছনে বল্লম উঁচিয়ে বনপথ দিয়ে তারা আমাদের গ্রামের দিকে নিয়ে চলল ।

তখন ভোরের আবছায়া ভাব কেটে গিয়ে চারদিক আলোয় চিকচিক করছে, পাখি ডাকছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঝাঁক-ঝাঁক আলোর তীর এসে বল্লমের ফলায় ঝিলিক দিচ্ছে । খানিক পথ যাবার পর পেয়াদাদের একজন আমাকে দেখিয়ে বলল, ‘রাজাবাবুর হুকুম ছিল ঘোড়া পাকড়ে আনতে হবে । গাধাটাকে অ্যাদ্দূর টেনে নিয়ে যাবার দরকার কী! যা ভাগ— ব্যাটা, পুঁচকে রাখাল!’ বলে আমার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক রদ্দা কষাল । দু-হাত বাঁধা অবস্থায় ছিটকে গিয়ে আমি একটা কাঁটাঝোপে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম । যন্ত্রণায় অপমানে আমার চোখে জল আসছিল, আমি দড়ি-বাঁধা দু-হাত জোড় করে আকাশ-বাতাসের দিকে চেয়ে বললাম, ‘ভোরবেলাকার আকাশ, তুমি সাক্ষী রইলে, ভোরবেলাকার বাতাস, তুমি সাক্ষী রইলে, বিনা-দোষে মল্লিকরাজ আমার শাদাপালকে কেড়ে নিয়েছেন । রাজা আমার অন্ন ঘুচিয়েছেন, আশ্রয় ঘুচিয়েছেন, আমাকে অপমান করেছেন, আমার প্রাণের বন্ধু শাদাপালকে নির্যাতন করেছেন । আমি যদি আমার মাকে কোনওদিন কষ্ট না দিয়ে থাকি, যদি আমার বাবাকে কোনওদিন কষ্ট না দিয়ে থাকি, যদি আমার গ্রামের কাউকে কোনওদিন কষ্ট না দিয়ে থাকি, তাহলে, ভোরবেলাকার আকাশ-বাতাস, তোমরা শোন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি— আমি গ্রাম ছাড়বার সময় আমার সুপুরিগাছে বারোটা বলয় দেখে এসেছি, ওই গাছে ষোলো বলয় পূর্ণ হবার আগে রাজাকে আমি পথের ধুলোয় শোয়াব ।’

এইরকম প্রতিজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে দেখি, বল্লমের ঝিলিক তুলে ওরা শাদাপালকে নিয়ে চলে যাচ্ছে । যেতে-যেতে শাদাপাল একবার কোনওরকমে পিছনে তাকাল, তার গায়ে এত শক্ত বাঁধন যে ঘাড় ঘোরাতে তার খুব কষ্ট হল, এত দূর থেকেও আমি বুঝতে পারলাম । আমার পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়ালাম । সারা দুপুর হেঁটে গ্রামের শেষে একটা খালি কুঁড়েঘর দেখে তার দাওয়ায় শুয়ে পড়লাম । খিদে-তেষ্টায় আমার কষ্ট হচ্ছিল, শুয়ে-শুয়ে নিজের ভবিষ্যতের কথা, শাদাপালের কথা, আমার গাঁয়ের কথা, আমার মায়ের কথা ভাবতে-ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ।

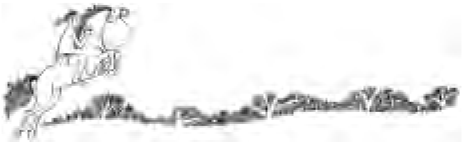

ঘুমের মধ্যে আমি শুনতে পেলাম শাদাপাল চিঁহিঁ-চিঁহিঁ করে ডাকছে । শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল । দেখি চারদিক জুড়ে অন্ধকার রাত, আকাশ তারায় ভরা, আর সত্যি-সত্যিই অনেক দূর থেকে হাওয়ায় শাদাপালের ক্ষীণ ডাক ভেসে আসছে ।

হাওয়ায় কান রেখে আমি সেই ডাক শুনতে লাগলাম । মাঝে-মাঝে হাওয়া দিক বদলায়, ডাক শুনতে পাই না । আবার হাওয়ার মুখ ঘুরলে শুনতে পাই । কান সজাগ রেখে বসে আছি, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় যেন তার খুরের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল । একটু পরে একটানা খুরের শব্দ আর মাঝে-মাঝে পরিষ্কার চিঁহিঁ-চিঁহিঁ ডাক শুনতে পেলাম ।

ক্রমে সেই শব্দ জোরালো হতে-হতে একেবারে আমার সামনে এসে থামল । দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে আমি শাদাপালের গলা জড়িয়ে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম । তার গরম নিশ্বাস আমার গায়ে লাগছিল । দেখলাম শাদাপালকে ওরা লাগাম পরিয়েছে, পালিশ-করা চামড়ার লাগাম, তাতে ঝকমকে পেতলের আংটা লাগানো । আমি তার কাঁধ চাপড়ে বললাম, 'সাবাশ শাদাপাল! রাজার দড়িও তোকে বেঁধে রাখতে পারেনি! ওরা তোকে ঘাস-জল দিয়েছিল?'

শাদাপাল একবার চোখ তুলে তাকাল । তখন আকাশে নারকোলের ফলার মতো একফালি চাঁদ উঠেছে । আমি বুঝলাম ওর আজ খাওয়া হয়নি । আমি ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম ।

আমি হাত বুলিয়ে দিলে এমনিতে ও খুব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু আজ ঘন-ঘন চিঁহিঁ-চিঁহিঁ করে ডাকতে লাগল, কয়েকবার আমার গায়ে মুখও ঘষল । আমি বললাম, 'কী হয়েছে রে?' উত্তরে সে আমার আরও কাছে এসে আমাকে তার পিঠে চড়ে বসতে ইঙ্গিত

করল। আমি এপর্যন্ত কখনও ওর পিঠে উঠিনি, উঠব কি-না ভাবছি, এমন সময় শাদাপাল জোরে চিঁহিঁ-চিঁহিঁ করে ডেকে উঠল । আমি বুঝলাম, ও বলতে চাইছে মল্লিকরাজের পেয়াদারা পিছু নিয়েছে । আমি তার পিঠে চড়ে বসলাম । বসামাত্র শাদাপাল সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর তীর ছোড়বার ঠিক আগের মুহূর্তের ধনুকের মতো দেহটাকে তীক্ষ্ণ করে নিয়ে তীরের মতো ছুটে গেল অন্ধকারের মধ্যে ।

৩

ছুটতে ছুটতে, সূর্য যখন পুব-আকাশে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠেছে, তখন আমরা একটা গ্রামে পৌঁছলাম । সেই গ্রামের তিনদিক ঘিরে নদী । নদীর ধারে ঘোড়া থেকে নেমে আমি প্রথমেই কিছু ঘাস উপড়ে নিয়ে নদীর জলে ধুয়ে শাদাপালককে খেতে দিলাম । তারপর আঁজলা ভরে জল এনে-এনে ওকে খাওয়ালাম ।

নদীর তীর বরাবর, হাঁটুজলে, গ্রামের মেয়ে-বউরা, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা, ছোট-ছোট জাল দিয়ে মাছ ধরছিল । আমি দেখলাম সবাই খুব রোগা । তাদের মধ্যে একজন, সে-ও খুব রোগা, এক থুত্থুড়ে বুড়ি, সে শুধু-হাতে মাছ ধরছিল, আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে পিট-পিট করে চেয়ে থেকে শেষে বলল, 'তোমার দেশ কোথায় গো বাছা?'

আমি বললাম, 'সে এখান থেকে অনেক দূর । হাঁটা পথে হয়তো তিন মাসও লাগতে পারে পৌঁছতে ।'

বুড়ি কী বুঝল জানি না, বলল, 'না বাবা, তুমি মিথ্যে বলছ । তুমি ভগবানের দেশ থেকে এসেছ । না-হলে অমন ভোরের আকাশের মতো চোখ হয়? আর আমার এত বয়স হল, অমন শাদা মেঘের মতো ঘোড়াও তো কখনও দেখিনি!' বলে বুড়ি ও আর যারা মাছ ধরছিল— সবাই মিলে আমাকে গ্রামের ভেতরের দিকে নিয়ে গেল ।

সেখানে মাটির দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা বাড়ির উঠোনে জল ছিটিয়ে চাটাই পেতে আমাকে বসতে দিল । দুজন মেয়ে তালপাতার পাখা নিয়ে আমাকে আর শাদাপালকে বাতাস করতে লাগল । আর কয়েকজন অনেকগুলো ডাব কেটে মিষ্টি জল আর ক্ষীরের মতো শাঁস খেতে দিল । খাওয়া হয়ে গেলে বুড়ি বলল, 'বাবা, ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছে । আমার গ্রামের ছেলেদের তুমি বাঁচাও ।'

আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

তখন বুড়ি বলল, 'বাবা, চিরকাল এমন ছিল না । ক'বছর আগেও এ-গ্রামের মাঠে-মাঠে অগুনতি দুধেল গাই চরে বেড়াত । খেতে-খেতে বলদের ল্যাজে পাক দিয়ে আর মুখে হেট-হেট আওয়াজ তুলে জোয়ান ছেলেরা লাঙল দিত, নদীর ধার পর্যন্ত ধান ফলাত, ঘরে-ঘরে মেয়েরা গোলাভরা সেই ধান ঢেঁকিতে কুটে চাল বার করত, তারা চিঁড়ে কুটত, খই ভাজত, পিঠে বানাত, অঘ্রান মাসে নবান্নের দিনে নতুন চালের গন্ধে সারা গ্রাম ম-ম করত, সেই গন্ধে কত দূর-দূর দেশ থেকে কত-যে কাক আসত তা কেউ কখনও গুনে শেষ করতে পারেনি । এক বছর, কী হল কে জানে, মড়ক লেগে গরু-বলদ সব মরে যেতে লাগল । যে-কটা বাঁচল তারাও নামেই বেঁচে রইল, তারা উঠে দাঁড়াতেই পারে না, রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা নিয়ে মাসের পর মাস তারা শুয়ে থাকে, তারপর একদিন মরে যায় ।

'গ্রামে দুধ বলতে আর কিছুই রইল না, সাতবাড়ি ঘুরেও কেউ এককোঁটা দুধ পায় না । সবচেয়ে বড় বিপদ হল, বাবা, চাষ বন্ধ হয়ে গেল । এককণা ধানও ফলানো গেল না ।

ধান দেখতে কেমন— তা-ই যেন আমরা ভুলে গেছি । চাষ ছাড়া কি জোয়ান ছেলেরা থাকতে পারে? কেউ-কেউ তো গ্রাম ছেড়ে বিদেশে চলে গেল, বাকিরা পেটের খিদেয়, মনের দুঃখে গরুগুলোর মতোই হাড়-জিরজিরে চেহারা নিয়ে ঘরে শুয়ে-শুয়ে ধুঁকতে লাগল ।

‘কী করব বাছা, আমি এই বুড়ো বয়সে গ্রামের মেয়েদের আর বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে নিয়ে রোজ নদীতে যাই । ওই মাছ আর বন-বাদাড়ের শাক-পাতা আর ডাব খেয়ে কদিন থাকা যায়? দুবেলা দুমুঠো ভাত না-হলে মানুষ বাঁচে! এদিকে জলে-জলে হাতে-পায়ে হাজা ধরে গেল ।

‘গ্রামের ওঝা, বৈদ্য, ফকির কত ঝাড়ফুঁক, কত তুকতাক করল, কত দেবতার কাছে কত পুজো দিলাম, মানত করলাম— একটা ছেলে, একটা গরুও উঠে দাঁড়াল না । তুমি একটা উপায় করো বাবা, তোমার চোখ দেখে মনে হয়, উপায় তুমি জানো ।’

সব শুনে আমি বললাম, ‘বুড়ি-মা, তুমি যেমন ভাবছ, আমি সত্যিই তেমন কোনও উপায় জানি না । তবে তোমাদের দুঃখে আমিও দুঃখ পাচ্ছি, তাই তোমাদের বাঁচাবার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব । রুগণ গরু ও মানুষেরা কোথায় আছে, আমাকে দেখাও ।’

বুড়ি আমাকে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সমস্ত দেখাল । আমি প্রথমে ঘরে-ঘরে ঢুকে বিছানায় লেপটে থাকা হাড়-জিরজিরে চেহারার লোকগুলোকে দেখলাম, তারপর গোয়ালে গিয়ে কঙ্কালসার গরুগুলোকে ভালো করে লক্ষ করলাম । আমি ছেলেবেলা থেকে গরু

চরাই বলে গরুর অনেকরকম অসুখের কথা জানতাম, নানারকম লতাপাতা ও গাছের শেকড় বেটে কয়েকটা ওষুধও তৈরি করতে পারতাম ।

সেদিন সারাদিন শাদাপালকে সঙ্গে নিয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে আমি কয়েক ধরনের লতাপাতা ও গাছের শেকড় যোগাড় করলাম । বিকেলে নদীর রাঙাজলে সেগুলো ধুয়ে, বেটে, রস করে সন্ধের আগেই গরুগুলোকে খাইয়ে দিলাম । এমনি করে প্রতিদিন গরুগুলোকে কয়েক ফোঁটা করে রস খাওয়াই আর ভোরে উঠে গোয়ালে গিয়ে তাদের অবস্থা দেখি । দেখে, দু-একটা লতাপাতা বা শেকড় বদলে দিই ।

একদিন, তখনও ভোর হয়নি, হঠাৎ হাম্বা-হাম্বা রব শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল । দেখি গ্রামের মেয়ে-বউরা, বাচ্চারা, গ্রামের মধ্যে গরুর ডাক শুনে রাত থাকতেই উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আনন্দে হৈ-চৈ করতে লেগেছে । তখন, যে-সব গরুর বাছুর ছিল, তারা দুধ দিতে লাগল, যে-সব গরুর বাছুর ছিল না তাদের বাছুর হল, তারাও দুধ দিতে লাগল । সাতদিন সেই দুধ খেয়ে সেই হাড়-জিরজিরে লোকেরা গায়ে বল ফিরে পেল, তারা দিব্যি উঠে দাঁড়িয়ে বলদের ল্যাজে পাক দিয়ে আর মুখে হেট-হেট আওয়াজ তুলে খেতে-খেতে লাঙল দিতে লাগল, তারা নদীর ধার পর্যন্ত ধান ফলাল, ঘরে-ঘরে মেয়েরা গোলাভরা সেই ধান ঢেঁকিতে কুটে চাল বার করল, তারা চিঁড়ে কুটল, খই ভাজল, পিঠে বানাল । অঘ্রান মাসে নবান্নের দিনে নতুন চালের গন্ধে কত দূর-দূর দেশ থেকে কত-যে কাক এল তা কেউ আর গুনে শেষ করতে পারল না ।

তখন গ্রামের জোয়ান লোকেরা আমাকে বলল, ‘বন্ধু, তুমি আমাদের জীবন দিয়েছ, আমাদের গ্রামকে সবুজ করেছ— তুমি আমাদের রাজা, আমাদের দেবতা । তোমার জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি ।’

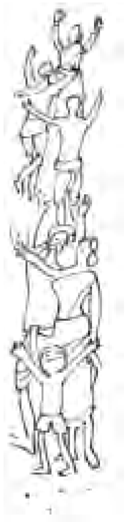

আমি তাদের বললাম, ‘আমি দেবতা নই, আমি তোমাদের বন্ধু । শোনো— আমার দেশের রাজা আমার শাদাপালকে কষ্ট দিয়েছেন, রাজা আমাকে ভিটে-মাটি ছাড়তে বাধ্য করেছেন । আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, রাজাকে আমি পথের ধুলোয় শোয়াব । তোমরা যদি একাজে আমার সহায় হও, আমি চিরকাল তোমাদের ভালোবাসা মনে রাখব ।’

শুনে তারা একসঙ্গে হাতের মুঠো আকাশে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আমরা তোমার সহায়, আমরা এখুনি যাব ।’

আমি দু-হাত তুলে তাদের শান্ত করে বললাম, ‘মল্লিকরাজ শুধু তো লোক দিয়ে লড়াই করবেন না, তাদের হাতে অস্ত্রও থাকবে। আমরা কী নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব?’

তারা চেঁচিয়ে বলল, ‘আমাদের অস্ত্র চাই।’

আমি বললাম, ‘তাহলে, বন্ধু, ঠান্ডা মাথায় আমাদের ভাবতে হবে, কোথা থেকে অস্ত্র পাওয়া যায়। যুদ্ধে যাবার দিন-ক্ষণ আমরা পরে ঠিক করব।’

বললাম বটে ভাবতে হবে, কিন্তু ভেবে আমি কূল-কিনারা পেলাম না। কত দিন গেল, রাত গেল, শীত গেল, বসন্ত এল, শিমুলফুলে গ্রামের উত্তর-আকাশ লাল হয়ে উঠল— আমার শুধু এক চিন্তা, কী করে অস্ত্র যোগাড় হবে। প্রতি বছর বসন্ত এলে আমার মন নেচে ওঠে, এবার আর কোনও কিছুতেই মন বসল না। সারাদিন অস্ত্রের কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুরে বেড়াই, আর সারারাত গোয়ালের পাশের চালাঘর থেকে শাদাপালের পা-ঠোকার আওয়াজ শুনতে-শুনতে ভাবি, ‘তবে কি আমার প্রতিজ্ঞা বিফল হবে!’

একদিন, এইরকম, রাতে বসে-বসে ভাবছি, এমন সময় থুত্থুড়ে সেই বুড়ি অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, ‘বাবা, তোমার কিসের এত চিন্তা আমি জানি। তোমার চিন্তা দূর করবার উপায়ও আমি জানি। এতদিন বলিনি, শুনলে তুমি তখনই আমাদের গ্রাম ছেড়ে বিপদের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে। তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার মন চায় না, অথচ ভেবে-ভেবে তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ দেখে আমার বুক ফাটে। আজ তোমাকে অস্ত্রের সন্ধান বলব। আমার সঙ্গে এসো। সাবধান, কেউ না জেগে ওঠে।’

এই বলে বুড়ি আমাকে নিয়ে পা টিপে-টিপে নদীতীরে এসে দাঁড়াল। তারপর পিছনে গ্রামের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে, নদীর অন্ধকার ওপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘শোন, শুনতে পাচ্ছ— ওই পার থেকে কারা বাঁশি বাজাচ্ছে!’

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ, ভালো করে শুনে বুঝতে পারলাম, নদীর ওপার থেকে সত্যিই বাঁশির সুর ভেসে আসছে— যেন একসঙ্গে অনেক লোক একই সুর বাজাচ্ছে ।

বুড়ি ফিসফিস করে বলল, ‘ওরা সারারাত বাঁশি বাজায় । ওই বাঁশির সুর যতদূর যাবে, ততদূর পর্যন্ত ওরা তীর ছুড়তে পারে । আমার ছেলেবেলায় একবার এই নদীতীরে, এই যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওদের দেশ থেকে একটা তীর এসে পড়েছিল । তীর দেখে আমার ঠাকুরদারা তো ভয়ে সারা । গ্রামের পুরুতরা বলল, আমাদের ওপর কোনও কারণে ওরা রুষ্ট হয়েছে । ওদের রোষ নামাতে পুরো একমাস ধরে গ্রামের সমস্ত গাইয়ের দুধ থেকে ঘি বানিয়ে নদীতীরে যজ্ঞ করা হল । এমনভাবে যজ্ঞ সাজানো হয়েছিল যাতে নদীর ওপার পর্যন্ত ধোঁয়া ও ঘিয়ের গন্ধ পৌঁছয় । সেই একমাস গ্রামের কোনও শিশু একফোঁটা দুধ পায়নি । ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, ওদের মতো মারাত্মক তীরন্দাজ জাত পৃথিবীতে আর নেই ।

‘ওদের মতো তীর-ধনুকও আর কোনও দেশের লোক বানাতে পারে না । প্রাচীন বটগাছের ঝুরি বাঁকিয়ে আর বুনো শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি রোদে শুকিয়ে তাই দিয়ে ওরা ধনুক বানায় । ওদের দেশ থেকে ওই তীর-ধনুক যদি আনতে পারো, তাহলেই তোমার চিন্তা দূর হবে । তুমি তোমাদের রাজার অপরাধের শাস্তি দিতে পারবে ।

‘কিন্তু বাছা, মনে রেখো, বিদেশি এসেছে টের পেলেই ওরা তাকে তক্ষুনি মেরে ফেলে । কোনও বিদেশি কোনওদিন ওদেশে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে, এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি ।’

৪

বুড়ির মুখে সমস্ত শুনে সেই রাতেই আমি কতগুলো বাঁশ পাশাপাশি ও আড়াআড়ি বেঁধে তার ওপর চড়ে শাদাপালকে নিয়ে নিঃশব্দে নদীতে ভেসে পড়লাম ।

সাতদিন সাতরাত বাঁশের দাঁড় বেয়ে ওপারে যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে শুধু ধু-ধু বালির চড়া । জনমানুষের চিহ্ন নেই, গরু-ছাগল নেই, কেবল কচ্ছপের মতো বড়-বড় লাল কাঁকড়া চরে বেড়াচ্ছে । চড়ার শেষে বিরাট-বিরাট বুনো গাছ, আর তার ওদিকে ঘন বন আমার চোখে পড়ল ।

শাদাপালের পিঠে চড়ে নদী পিছনে রেখে আমি প্রবল গতিতে ঘোড়া ছোটালাম । চড়া পেরিয়ে, বিরাট-বিরাট বুনো গাছ দু-পাশে ফেলে যেই বনের মধ্যে ঢুকেছি, অমনি কোথা থেকে একঝাঁক তীর এসে বেড়ার মতো আমাদের পথ আগলে মাটিতে বিঁধল । আমি রাশ টেনে ধরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে অন্যপথে বনের মধ্যে এগোতে লাগলাম ।

কিছুটা যেতে-না-যেতেই আবার একঝাঁক তীর এসে আমাদের পথ আটকাল, আমিও আবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আরেকদিক দিয়ে এগোতে লাগলাম, সেদিকেও একঝাঁক তীর এসে আমাদের সামনে মাটিতে বিঁধল । আমি শাদাপালের ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বললাম, 'তীরের বেড়া ডিঙিয়ে যা— পারবি না?' বলে সোজা হয়ে বসে লাগামে জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই শাদাপাল একলাফে তীরের বেড়া ডিঙিয়ে তীরের বেগে ছুটে চলল বনের মধ্যে । ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ দারুণ চিঁহিঁহিঁ শব্দে ডেকে উঠে পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে সে একমুহূর্ত সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল । দেখি, ওর গলার নীচে মস্ত একটা তীর বিঁধে রয়েছে, আর সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে । জীবনে আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু শাদাপালের এই অবস্থা দেখে আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠল । রক্তে মাটি ছপ-ছপ করছে, ওর দু-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কী করব বুঝতে না-পেরে আমি একটানে তীরটা বের করে ফেলে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম । হায়, হায়! অস্ত্রের সন্ধানে এসে তবে কি শাদাপালকে হারাব!

হঠাৎ চারদিকে শুকনো পাতার মচমচ শব্দে মুখ তুলে দেখি, বিরাট চেহারার শত-শত লোক চারদিক থেকে আমার কাছে এগিয়ে আসছে । তাদের প্রত্যেকের হাতে বড়-বড় তীর-ধনুক । কাছাকাছি এসে হাতের তীর-ধনুক মাটিতে নামিয়ে রেখে তারা প্রণাম করার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল । তারপর তাদের একজন ধীর পায়ে এগিয়ে এসে রক্তমাখা তীরটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে শাদাপালের রক্তে-ভেজা মাটির চারপাশে দাগ কাটল । আরেকজন হাতের তালুতে কী-একটা গাছের পাতা ঘসে সেই রস শাদাপালের ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দিল । নিমেষে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল, শাদাপালও ছটফটানি থামিয়ে শান্ত হল । তাই দেখে লোকেরা রাশি-রাশি খাবার এনে শাদাপালের সামনে সাজিয়ে দিল । একজন, তার মাথায় শাদা শঙ্খের মুকুট, গলায় রঙিন পাথরের মালা, বাহুতে রঙিন ঝিনুকের বালা, কোমরে লাল কাঁকড়ার শক্ত খোলার ঘুনসি, শাদাপালের একেবারে কাছে এসে হাঁটু গেড়ে তাকে প্রণাম করে আমাকে বলল, 'বিদেশি, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?'

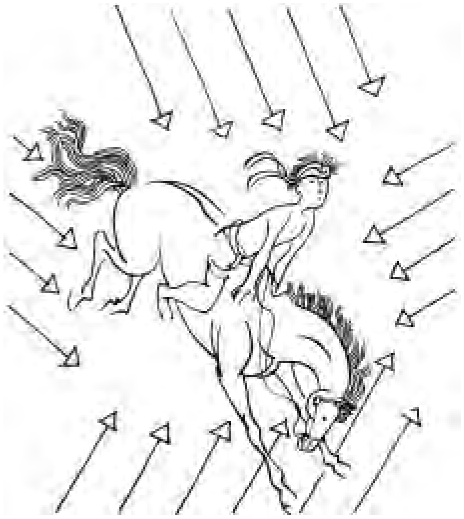

মাথার মুকুট ও দেহের অলংকার দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ইনিই এদেশের রাজা। আমি মাটিতে শুয়ে পড়ে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, 'আমি একজন দীন রাখাল। বহু দূরের দেশ থেকে এসেছি।'

শুনে রাজা বললেন, 'শোন, পুরুষানুক্রমে এদেশে এই প্রথা চালু আছে যে, কোনও বিদেশি এদেশের মাটিতে পা দিলেই তাকে হত্যা করা হবে। ধনসম্পদের লোভে এর আগে অনেক বিদেশিই এদেশে এসেছে, তারা কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি, তুমি যে এখনও বেঁচে আছো তার কারণ তোমার ওই ঘোড়া। শাদা ঘোড়া আমাদের দেবতা। তার গায়ে আমাদের তীরের হাওয়া লাগলেও আমাদের অমঙ্গল। পাছে তোমাকে মারতে গিয়ে ঘোড়ার গায়ে তীর বেঁধে, তাই আমার সৈন্যরা বারবার তীর ছুড়ে তোমার পথ আটকেছে, বিদেশি দেখেও তোমাকে মারেনি। পথ বন্ধ দেখে তুমি ঘোড়া থেকে নামলে তোমাকে হত্যা করা হবে— এই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। কিন্তু তুমি ঘোড়াসমেত তীরের বেড়া ডিঙিয়ে গেলে দেখে তোমার বুক লক্ষ করে তীর ছুড়তে হল। খুবই সাবধানে ছোড়া হয়েছিল, আমাদের তীরও কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু তোমার ঘোড়া কৌশলে বুক দিয়ে তীর ঠেকিয়ে তোমাকে বাঁচাল। শাদা ঘোড়া তোমাকে বাঁচিয়েছে, বুঝতে পারছি, তুমি আমাদের শত্রু নও, তুমি ধনসম্পদের লোভে আসনি, তুমি আমাদের বন্ধু। আমি তোমাকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি। বিদেশি বন্ধু, বলো কী তুমি চাও। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে শাদা ঘোড়ার রক্তপাতের পাপ থেকে আমরা মুক্ত হব।'

আমি রাজাকে আরেকবার নমস্কার করে বললাম, 'মহারাজ, আমি একজন সামান্য রাখাল। রাজার বাড়ির গরু চরিয়ে, মাঠে-মাঠে ছয় ঋতুর রং দেখে আর আমার এই প্রাণের বন্ধু শাদাপালের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে চমৎকার আমার দিন কেটে যাচ্ছিল।

'একদিন রাজা টাকার জোরে শাদাপালকে কেড়ে নিতে চাইলেন। পেয়াদা পাঠিয়ে তাকে নির্যাতন ও আমাকে অপমান করলেন। আমি শাদাপালকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছাড়বার সময় প্রতিজ্ঞা করেছি, রাজাকে আমি পথের ধুলোয় শোয়াব। মহারাজ, আপনি যদি আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান, তাহলে আমাকে আপনাদের কয়েকটা তীর-ধনুক দিন, সেই তীর-ধনুক নিয়ে আমি রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করব। মহারাজ, অন্য কিছুই আমি চাই না।'

রাজা বললেন, 'তুমি বীর। তোমাকে একশো ধনুক ও শত-শত তীর দেব। তুমি আরও কিছু চাও।'

আমি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে বললাম, 'মহারাজ, আপনার দান আমি চিরকাল মনে রাখব। আর কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই।'

রাজা বললেন, 'তুমি নির্লোভ, তোমাকে বন্ধু পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে একটা মহামূল্য উপহার দেব। এখন প্রাসাদে চলো।'

বলে রাজা আমাকে ও শাদাপালকে নিয়ে তাঁর প্রাসাদের দিকে চললেন। পিছনে শত-শত লোকের বিরাট মিছিল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কাঠের তৈরি রাজার বিরাট প্রাসাদ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বনের কাঠ দিয়ে যে এত সুন্দর রাজপ্রাসাদ বানানো যায়, আমি ভাবতে পারিনি। প্রাসাদে পৌঁছে পরিষ্কার

তকতকে কাঠের বাটি ভরে-ভরে তারা আমাদের অনেক রকম মধু খেতে দিল । বড়-বড় রঙিন ঝিনুক ভরে দিল মহিষের ঘন দুধ । তারপর সারারাত ধরে তারা বাঁশি বাজাল । আশ্চর্য তাদের বাঁশি । যেন বাঁশির মধ্য দিয়ে তারা কথা বলছে ।

তাদের স্বপ্নের কথা, কল্পনার কথা, আনন্দের কথা, দুঃখের কথা! শুনতে-শুনতে আমার বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল ।

পরদিন ভোরবেলা রাজা আমাকে বিদায় দিতে নদীর ধু-ধু চড়ায় এসে দাঁড়ালেন । তীর-ধনুক ও শাদাপালকে বাঁশের চওড়া ভেলায় তুলে দিয়ে আমি রাজার সামনে নিচু হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম ।

রাজা বললেন, ‘বন্ধু, আমার প্রীতির চিহ্ন হিসেবে, এই নাও, এই বাঁশি তোমাকে দিলাম । তোমার জীবনের যে-সব কথা, যে-সব সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তুমি পাঁচজনকে শোনাতে চাও, এই বাঁশিতে ফুঁ দিলেই সব সুর হয়ে ফুটে উঠবে । তুমি জয়ী হও ।’

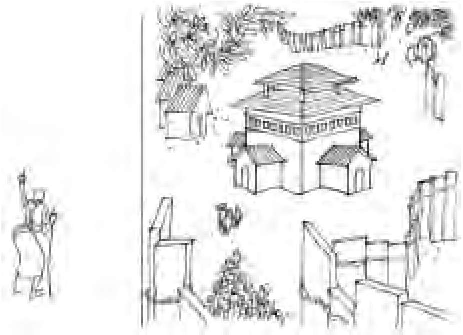

তখন বালিতে আলোর আভা লেগেছে, নদীর জলে আভা জেগেছে, সমস্ত পুবদিক রঙে দপদপ করছে । দাঁড় বাইতে-বাইতে যতক্ষণ চড়া দেখা গেল, দেখলাম রাজা ভোরের আভার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন ।

দিনের পর দিন দাঁড় বেয়ে শেষে একদিন সেই থুখুড়ে বুড়ির গ্রামে ফিরে এলাম । আমাকে ফিরে পেয়ে বুড়ির আঁকিবুকি-ভরা মুখ হাসিতে ভরে গেল । আর গ্রামের জোয়ানেরা যুদ্ধে যাবার তোড়জোড় করতে লাগল । সেখানে কিছুদিন নদীর মাছ, সুগন্ধি চালের ভাত, কালো গাইয়ের দুধ আর মিষ্টি ডাবের জল খেয়ে, আর সকলে মিলে তীর-ধনুক মহড়া দিয়ে একদিন আমরা দল-বেঁধে আমার দেশের দিকে রওনা দিলাম ।

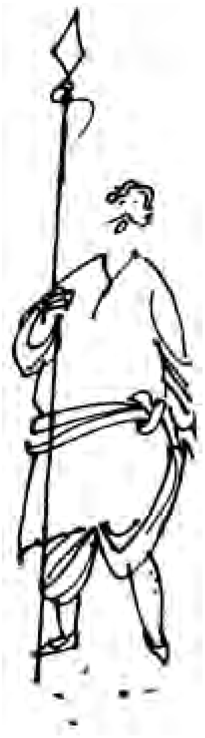

৫

গ্রামে পৌঁছে, এতদিন পর গ্রামের চেনা গাছ-পালা, পুকুর, মাঠ দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠল । এমনকী বাজে-পোড়া নারকোল গাছটাও আমার ভালো লাগল, বরাবরের মতো তার গা একটা কাঠ-ঠোকরা পাখি ঠোকরাচ্ছে ।

একটুও বিশ্রাম না নিয়ে আমরা গ্রামের পুবদিক বরাবর এগিয়ে গিয়ে রাজবাড়ির সামনে দাঁড়ালাম । আমি শাদাপালের পিঠে দলের একেবারে সামনে গিয়ে আকাশে মুখ তুলে চিৎকার করে বললাম, ‘আমি বিজু-রাখাল ফিরে এসেছি । কোথায় রাজা? তাঁকে তাঁর দম্ভ ও অবিচারের শাস্তি নিতেই হবে । রাজা কোথায়?’

কোলাহল শুনে রাজবাড়ির পেয়াদারা রে-রে শব্দে বল্লম উঁচিয়ে দৌড়ে এল । এসে আমাদের একশো জোয়ানের হাতে তীর-বসানো মস্ত-মস্ত বাঁকানো ধনুক দেখে তাদের মুখের রে-রে মুখেই মিলিয়ে গেল, আর উঁচোনো বল্লমগুলো আকাশের গায়ে ছবির মতো স্থির হয়ে রইল ।

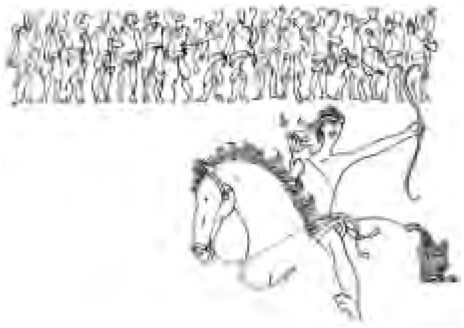

আমি আবার চিৎকার করে বললাম, ‘আমি বিজু-রাখাল এসেছি। রাজা কোথায়?’

এবার মল্লিকরাজ স্বয়ং বিশাল বর্শা হাতে বেরিয়ে এলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের দিক থেকে একটা তীর ছুটে গিয়ে রাজার বুকের কাছ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। রাজা নিমেষে পথের ধুলোয় শুয়ে পড়ে কোনওরকমে প্রাণ বাঁচালেন। আমি শাদাপালকে ছুটিয়ে সেখানে গিয়ে দু-হাত ধরে রাজাকে ধুলো থেকে তুলে বললাম, ‘রাজা, যেদিন আপনি পেয়াদা পাঠিয়ে আমার শাদাপালকে কেড়ে নিয়েছিলেন, সেদিন আমি আকাশ-বাতাস সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি আপনাকে পথের ধুলোয় শোয়াব, আমার সেই প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার শক্তি ও নিষ্ঠুরতা এবার আপনি ক্ষমা করুন। আমি আপনার সামান্য রাখাল।’

এই কথা শুনে রাজা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, ‘ক্ষমা তোমাকে নয় ভাই, তুমিই আমাকে ক্ষমা করো। আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম, তুমি আমার চোখ ফোটালে।’

তারপর নিস্পন্দ পেয়াদাদের দিকে ফিরে বললেন, ‘বল্লম ফেলে, এখুনি যা, অতিথিশালা খুলে দে— এরা আমাদের গ্রামের অতিথি। সবাইকে বলে দে— আজ সব গরুর দুধ দোয়াতে হবে, সব পুকুরে জাল ফেলতে হবে, সব গাছের ফল পাড়তে হবে। আমাদের বিজু গ্রামে ফিরল, আজ গ্রামে উৎসব।’

এই বলে আমার বন্ধুদের অতিথিশালায় বসিয়ে মল্লিকরাজ আমাকে নিয়ে ওপরে অন্দরমহলের দিকে চললেন। সেখানে পৌঁছতেই কারা একসঙ্গে শাঁখ বাজাল আর উলু দিয়ে উঠল।

রানিমা আমাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘বাবা, তুমি বড় হয়েছ, মানুষের মতো মানুষ হয়েছ; আমাদের স্নেহের পুতুল, নয়নের মণি টুকটুককে তোমার হাতে দিলাম। তুমি ওকে তোমার ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে যেও।’

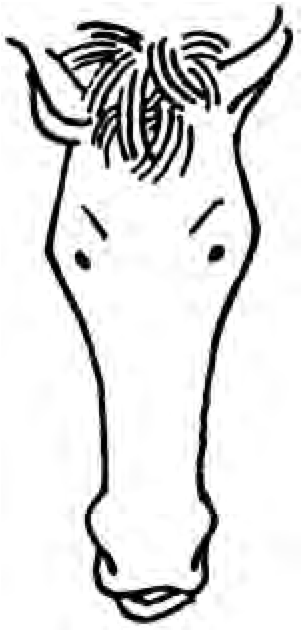

টুকটুক তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, নাকে নোলক, কপালে টিকলি আর লাল বেনারসীতে তাকে সত্যিই রাঙা টুকটুক দেখাচ্ছিল ।

রানিমা বললেন, ‘কী টুকটুক, খুশি তো?’

টুকটুক মাথা কাত করে বলল, ‘হুঁ-উ’ তার কপালের টিকলি তাতে একপাশে হেলে পড়ল ।

তারপর একদিন সানাই বাজিয়ে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল । আমি টুকটুককে নিয়ে রোজ শাদাপালের পিঠে চড়ে বেড়াতে যাই, আর এক-একদিন, যেদিন কেন জানি না, সকাল থেকেই আমার খুব মন কেমন করে, সেদিন দূর মাঠে গিয়ে বিরাট আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আপনমনে বাঁশি বাজাই ।